উপসংহার

আশাপূর্ণা দেবী বিংশ শতকের কথাসাহিত্যিক। তবে তাঁর সাহিত্য রচনায় ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সমাজ ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে। সেই সূত্রে প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হযেছে আশাপূর্ণা দেবীর জীবন ও সাহিত্য কৃতির একটি সাধারণ পরিচয়। সেইসঙ্গে যে সম্পর্কের ভিত নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি করে, সেই দাম্পত্য জীবনের কথা নানাদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে নির্যাস রূপে তুলে ধরা হয়েছে। 'আশাপূর্ণা দেবী' পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের থেকে একেবারে ব্যতিক্রমী ছিলেন না। তিনিও লেখার মাধ্যমে মূলত সমাজের নর-নারীর জীবনের বিভিন্ন সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন। বাঙালীসমাজ জীবনের আতুর ঘরের কথা তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয়েছে বলে সমালোচকরা মন্তব্য করে থাকেন। অবশ্য তাঁর উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলির জীবনক্রম বিশ্লেষণ করলে পাঠক নিজেই বুঝে উঠতে পারেন যে, কিভাবে তিনি উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙালীসমাজ জীবনের অলিখিত নানাতর ইতিহাসের কথা লিখে রেখেছেন। যে ইতিহাস কোনদিন কোন ইতিহাস বইয়ের পাতায় মুদ্রিত হয়নি, কালের নিয়মে অবক্ষয় প্রাপ্ত বিলুপ্ত প্রায়, সেই ইতিহাসকে ঔপন্যাসিক তাঁর লেখার মাধ্যমে ভাবিকালের মানুষের জন্য তুলে রেখেছেন। তবে আলোচ্য গবেষণায় কোন ইতিহাসের পুনঃরাবিষ্কারের কথা বলা হয়নি, মানুষের দাম্পত্য জীবনের নানাতর ঘাত-প্রতিঘাত, সংগ্রাম, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, কল্পনা-বাস্তব, চাওয়া-পাওয়ার বিভিন্ন মানসিকতার মাধ্যমে যে পরিণতি সাধন ঘটে; তারই চিত্ররূপ কিভাবে ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবী' উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন; এবং কেনই বা লিখেছেন তার সার্বিক সত্যের অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে 'আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসের ক্রমানুসারে পর্যায় বিভাগ। এই পর্বে তাঁর সাহিত্য রচনার ধারাকে তিনটি পর্বে

বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন ‘প্রভাত পর্বে’ ১৯৪৪-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই পর্বে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ‘মধ্যাহ্ন পর্বের’ উপন্যাসে নারীর অন্তঃপুরের কথা, নারীর অন্তঃমননের কথা বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। যা দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো সে কারণে এই পর্বে রচিত উপন্যাসগুলি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছে গেছে। এই পর্বের রচনা গুলির মধ্যে অন্যতম ‘বৃত্তপথ’, ‘যুগলবন্দী’, ‘সুবর্ণলতা’, ‘বিজয়ী বসন্ত’, ‘মনমর্মর’, ‘বকুলকথা’, ‘পলাতক সৈনিক’, ‘সুখের নিলয়’, ‘মায়াজাল’ ইত্যাদি উপন্যাসগুলি। ‘সায়াহ্ন পর্ব’ যেখানে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ আরো বেশী করে নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। এবং সমাজ বাস্তবতার নিরিখে নারী মনের জটিলতা ও দাম্পত্য সম্পর্ককে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ‘আশাপূর্ণা দেবীর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপরেখা। ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ থেকে ‘তারাশঙ্কর’ পর্যন্ত পুরুষ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। ঠিক একই সঙ্গে নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা কতটা স্বতন্ত্র ভাবে উঠে এসেছে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’ থেকে ‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’ পর্যন্ত নারী ঔপন্যাসিকদের রচনা আলোচিত হয়েছে। আর তারই নিরিখে সমাজ নিয়ন্ত্রক কিছু সমাজপতিদের দ্বারা আরোপিত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের কথা ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ লেখায় বেশী করে পাওয়া যায়। তাঁর পূর্ববর্তী ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’, ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, ‘তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়’, ‘বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের’ মতো পুরুষ ঔপন্যাসিকরা সমাজের নানা চিত্র উপন্যাসের পাতায় তুলে ধরেছেন। নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’, ‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’, ‘নিরুপমা দেবী’ থেকে ‘সীতা দেবী’, ‘শান্তা দেবী’, ‘রাধারাণী দেবী’দের উপন্যাসেও একইভাবে ফুটে উঠেছে

সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিন্নতর চিত্র। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ'। এখানে মূলত লেখিকার সমাজের রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে, নারী-পুরুষের বিচিত্র জীবন যাপনের চিত্রকে স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। কোথাও সুখী দাম্পত্য সম্পর্ক আবার কোথাও নষ্ট দাম্পত্যের কথা উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে নারীর সামাজিক অবস্থান'। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা কোণঠাসা। বিবাহ নামক যুপকাষ্ঠে নারীরা বলিপ্রদত্ত। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কুলীনবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ব্যধি নিঃসন্দেহে নারীর সামাজিক অবস্থানকে নির্দেশ করে। আবার কোথাও নারী ভোগ্যপণ্য বা পণ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত। অথবা নারী হয়ে উঠেছে পুরুষ শাসিত সমাজের পণ্যসামগ্রী। জন্মের পরে নারী পিতার পরিচয়ে পরিচিত, বিবাহের পর স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের পরিচয়ে বেঁচে থাকতে হয়। নারীর সামাজিক অবস্থানের নিরিখে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতাই বিশ্লেষিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। ষষ্ঠ অধ্যায় 'আশাপূর্ণা দেবী' ও অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে নারী ও পুরুষ ঔপন্যাসিকদের রচনার ধারা অনুসরণ করে আলোচিত হয়েছে তুলনামূলক দাম্পত্য সম্পর্ক। আসলে মানুষের জীবনের একটি অন্যতম অধ্যায় দাম্পত্য জীবন। যেখানে সামজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কারণে নারী ও পুরুষের ব্যবধানকে সুস্পষ্ট রূপে লক্ষ করা যায়। স্বাভাবতই নারী সেখানে প্রান্তিক। এবং এই প্রান্তিক অবস্থান থেকে কখনো কখনো উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। আবার কোথাও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে জীবনের ব্যর্থতা। যার গভীরে বহুলাংশে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাই দায়ী। এরূপ একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে 'আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসের দাম্পত্য সম্পর্কের বিভিন্ন দিক অবশ্যই সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচনা

করতে পারি। সেই সূত্রে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাসগুলি যেন সমাজ ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি।

আলোচনাকালে তাঁর সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনের প্রেক্ষিত, সফলতা ও পরাজয়ের কথাও প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা হয়েছে। তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, কোথায় ‘আশাপূর্ণা দেবী’ অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের থেকে দাম্পত্য জীবনের চিত্রাঙ্কনে সফল হয়েছেন, অথবা অনুসরণ করেছেন। তবে আলোচ্য গবেষণায় একটি বিষয় উঠে এসেছে যে, ‘আশাপূর্ণা দেবী’ পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের লেখার কখনো অনুকরণ করেননি, তিনি নিজেও সেকথা বহুবার স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে স্বভাবতই তাঁর লেখার সঙ্গে মিল দেখা যায় পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের লেখার। সেটা যে লেখার নিয়মেই চলে আসে সে কথা সকলেই জানে, কারণ তিনি যতটা না লেখিকা ছিলেন তার থেকে বেশী ছিলেন পাঠিকা। ‘রবীন্দ্রনাথের’ বেশীরভাগ কবিতা ছিল তাঁর মুখস্থ; তাঁর বোন ‘সম্পূর্ণা দেবীর’ সঙ্গে ছড়া মুখস্থ করার প্রতিযোগিতা ছিল তাঁর প্রতিদিনের কাজ। সেই খাতিরেই তিনি পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের লেখার কিছু ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন ও ঋণ গ্রহণ করে নিজের মতো করে মানবিক চরিত্র নির্মাণ করেছেন। সেই চরিত্রের মধ্যে বহুক্ষেত্রে তিনি মূলত অন্বেষণ করেছেন দাম্পত্য জীবনের ভিন্নতার মূল চাবিকাঠি। আদর্শ দাম্পত্য জীবনের সূত্র অন্বেষণে তাঁর নিরলস প্রয়াস লক্ষণীয়। কারণ তিনি মনে করেন আগামী প্রজন্মের পথ চলার জন্য কাউকে না কাউকে পথ কাটা শুরু করতে হবে, একদিন সেই পথকেই প্রয়োজনের খাতিরে কেউ চলার উপযোগী রাজপথে পরিণত করবেন। তাঁর সমকালে যে সমাজ ব্যবস্থা তিনি দেখেছেন, তাতে করে তাঁর মনে হয়েছিল নারীদের জীবনের চরম দুর্দশা মোচনের জন্য একমাত্র কলমকেই হাতিয়ার করে

নিতে হবে। মূলত নারীদের জীবনের দুর্দশার মূল কারণগুলি অন্বেষণ করে দেখা যায়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, দেবদাসী প্রথার মতো নানারকম কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে নারীরা পথভ্রষ্ট হয়। 'আশাপূর্ণা দেবী' সমস্তরকম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সৃষ্টি করলেন একের পর এক প্রতিবাদী নারী চরিত্র। কারণ তিনি মনে করেন নারীদের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য নারীকেই এগিয়ে আসতে হবে সবার প্রথমে। আর একটি পরিবারের সম্পূর্ণ মুক্তি সাধন অথবা উন্নতি সাধন একজন নারীর মাধ্যমেই সম্ভব। কোনোরকম নারীবাদ প্রতিষ্ঠা নয়; জীবনের সাযুজ্যে, জীবনের প্রয়োজনেই ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর অভিব্যক্তিকে তিনি উপন্যাসের চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন মাত্র। আলোচ্য গবেষণায় উক্ত বিষয়গুলির তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এবং প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা হয়েছে 'আশাপূর্ণা দেবীর' ভাবনায় দাম্পত্য জীবনের নানারকম বিশ্লেষণ। মূলত উপন্যাসের প্রক্ষিতেই তাঁর মতামতকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর গবেষণার নিয়মানুসারে ও প্রয়োজনের খাতিরেই তাঁর অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্টির কথাও প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হয়েছে বহুক্ষেত্রে। দাম্পত্য সম্পর্ক ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে 'আশাপূর্ণা দেবী' অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের তুলনায় বেশী চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং বিভিন্ন উপন্যাসে চরিত্রের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর অভিমতকে প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য গবেষণায় একদিকে যেমন দাম্পত্য জীবনের নানাতর দিক আলোচিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি দাম্পত্য-পূর্ব সম্পর্ক ও বিবাহকেন্দ্রিক নানা বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণা কর্মের মৌলিকতা কোনদিন কোন শুভানুধ্যায়ীর জীবনে শুভপরিণতি সাধিত করলে আমার পরিশ্রমের সার্থকতা প্রাপ্তি ঘটবে।

<<<<<>>>>>